৬৬তম অধিবেশন

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ

ভাষণ

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

শনিবার

০৯ আশ্বিন ১৪১৮

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

আস্‌সালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল/শুভ অপরাহ্ন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি বিশ্বাস করি, আপনার প্রাজ্ঞ ও দৃঢ় নেতৃত্বে এই অধিবেশন সর্বাত্মকভাবে সফল হবে। ৬৫তম অধিবেশনের সভাপতি জনাব জোসেফ ডেইসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সফলভাবে ৬৫তম অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য। এবছর সাধারণ অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য ''আন্তর্জাতিক বিরোধ নিরসনে শান্তিপূর্ণ মধ্যস্থতা''। এরকম প্রাজ্ঞ এবং সময়োচিত প্রতিপাদ্য নির্বাচনের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব মি. বান কি মুনকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদানকে জাতিসংঘের ১৯৩তম সদস্য হিসেবে স্বাগত জানাচ্ছি। একইসঙ্গে স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের জন্য আমি এই নতুন রাষ্ট্রের জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সম্মানিত সভাপতি,

শান্তিই হচ্ছে উন্নয়নের সোপান। আর শান্তি তখনই বিরাজ করে, যখন ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। এজন্য আমি মনে করি শান্তিপূর্ণ মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য স্বদেশে এবং বিদেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ''সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বৈরিতা নয়'' এবং ''সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান'' নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সাঁইত্রিশ বছর আগে এই দিনে এই মঞ্চ থেকেই তিনি একথা উচ্চারণ করেছিলেন। শান্তির এ বাণী শুধু উচ্চারণই করেননি, তিনি তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

এরই ধারাবাহিকতায় শান্তির জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা আমার সরকারের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল আদর্শ শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইনের শাসনের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তিতে আমাদের সাহায্য করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের অংশগ্রহণও একই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি অনুসরণ করেই আমাদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬% ধরে রাখতে পেরেছি। কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, অবহেলিত নারী পুরুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি।

সম্মানিত সভাপতি,

সময়ের পরিক্রমায় জাতিসংঘের ভূমিকায় পরিবর্তন এসেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষাই এখন জাতিসংঘের প্রধান কাজ নয়। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্তঃরাষ্ট্র জাতিগত সংঘাত নিরসন, সন্ত্রাসবাদ দমন, আন্তঃসীমানা অপরাধ দমন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলা, দারিদ্র্য বিমোচন, পানি ও জ্বালানি নিরাপত্তা তৈরি এবং ধনী ও গরীবের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বিলোপ।

এসব বিষয়ে জাতিসংঘের সাফল্যে আমাদের এই বিশ্বাসই জন্মেছে যে একবিংশ শতাব্দীতে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সকলের সম্মিলিত ইচ্ছাকে আরও জোরদার করার মত সক্ষমতা সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত

ও বৈধ একমাত্র আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতিসংঘেরই রয়েছে।এজন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘের মধ্যস্থতা সম্পর্কিত সনদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনাব মি. বান কি মুনের ''মধ্যস্থতা এবং সহায়ক কার্যক্রম বৃদ্ধি'' শীর্ষক প্রতিবেদনের ভূয়সী প্রশংসা করছে। পাশাপাশি আমরা সাধারণ অধিবেশনের ''বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতার ভূমিকাকে শক্তিশালীকরণ'' শীর্ষক সিদ্ধান্তের সহ-উদ্যোক্তা হয়েছি।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে ছত্রিশটি দেশের বায়ান্নটি মিশনে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত এক লাখ বাইশ হাজার চুরানব্বই জন শান্তিরক্ষী প্রেরণ করেছে। এসব মিশনে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের ১০৩ জন শান্তিরক্ষী শহীদ হয়েছেন।

জাতিসংঘের শান্তি স্থাপন কমিশনে NAM এর সমন্বয়কারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সবসময়ই সংঘাত-পরবর্তী সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন এবং প্রতিকারমূলক কূটনীতির পক্ষে অভিমত দিয়ে আসছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে DPKO-তে পরিকল্পনা এবং কৌশল প্রণয়ন পর্যায়ে বাংলাদেশের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নেই। ECOSOC ও Human Rights Council এর সদস্য হিসেবে আমরা গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার, নারীর সম অধিকার, শিশু অধিকার, সংখ্যালঘু ও সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য ভূমিকা রাখছি।

UNDP, UNFPA, UNICEF, UNESCO এবং FAO সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রীতি ও মান নির্ধারণে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সম্মানিত সভাপতি,

আমি বিশ্বাস করি ন্যায়বিচার শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামক। ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে পার্বত্য এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অধিকার রক্ষার জন্য আমি পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিষয়ে মধ্যস্থতার পথ বেছে নিয়েছিলাম। এই চুক্তির ফলে প্রায় ২০ হাজার মানুষের প্রাণ সংহারকারী দুই দশকের সংঘাতের অবসান ঘটে। একই সময়ে আমি প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ত্রিশ বছর-মেয়াদী গঙ্গা পানি চুক্তি স্বাক্ষর করি।

আমার বর্তমান মেয়াদে এই চলতি মাসেই ভারতের সাথে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমরা চূড়ান্ত সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। এই অমীমাংসিত বিষয়টি বিগত ৬৪ বছর ধরে আমার জনগণের দৈনন্দিন ভোগান্তির কারণ হয়ে ছিল। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সকল সমস্যা শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প।

আমার দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। এতে বাহাত্তর জন মানুষ নিহত হন। আমি আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান করি। এতে আরও প্রাণহানী এড়ানো সম্ভব হয়।

আমি বিশ্বাস করি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এজন্যই ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারের জন্য একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদের গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সনদের অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে আমরা অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অতীত ভুলের সংশোধনের এটিই একমাত্র পথ। এর মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য সুসংহত হবে।

আমি সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ নির্মুলের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসের শিকার। আপনারা জানেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট আমার পিতা বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমার মা ও তিন ভাইসহ পরিবারের আঠার জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে সেই নৃশংস ঘটনা স্মরণ করছি। ২০০৪ সালের ২১ শে আগস্ট আমার দলের একটি শান্তি সমাবেশে গ্রেনেড হামলা করা হয়। এতে চব্বিশ জন নেতাকর্মী নিহত হন এবং আহত হন আরও পাঁচ শতাধিক। ঐ জঘন্য ঘটনায় অলৌকিকভাবে আমি প্রাণে রক্ষা পেলেও আমার শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়।

নাইন-ইলেভেনসহ অন্যান্য সন্ত্রাসী হামলার যাঁরা শিকার তাঁদের কথা মনে হলে আমি ব্যথিত হয়ে পড়ি। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই এ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিচার হওয়া প্রয়োজন। আমাদের সরকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, দূর করতে সব ধরণের ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। UN Counter Terrorism Convention অনুসরণ করেই আমরা আমাদের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছি।

এই লক্ষ্যে সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিও শক্তিশালী করা হয়েছে। বিচার বিভাগ, আইনসভা, নির্বাচন কমিশন, এন্টি করাপশন কমিশন, হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, ইনফরমেশন কমিশন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলি মানবাধিকার সংরক্ষনের জন্য এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

শান্তির জন্য ন্যায়বিচার প্রয়োজন, আর শান্তি হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এজন্য আমাদের সকল নীতিতে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে আমরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করছি। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি এমডিজি-৪ অর্জনে আমাদের সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ গত বছর আমাদের পুরস্কৃত করেছে। দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত এমডিজি-১, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় এমডিজি-২, লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসে এমডিজি-৩ এবং মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে এমডিজি-৫ অর্জনে আমরা যথেষ্ঠ অগ্রগতি অর্জন করেছি।

দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের কৌশল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে মিল রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে আমরা বার মিলিয়ন মানুষকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি দিতে পারব বলে আশা করছি। সুষম উন্নয়নের জন্য আমরা সকল জাতীয় নীতিমালায় সমন্বিত নারী শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করেছি। প্রবাদে আছে 'একজন বালককে শিক্ষিত করলে একজন ব্যক্তিকে শিক্ষিত করা হয়। কিন্তু একজন বালিকাকে শিক্ষিত করলে পুরো পরিবার তথা পুরো জাতিকে শিক্ষিত করা হয়।'

এ কারণেই ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দায়িত্ব পালনকালে আমরা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করি। এবার আমরা এ নীতিকে আরও যুগোপযোগী করেছি। এই নীতিমালায় নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, তাঁদের সুরক্ষা এবং জেন্ডার সমতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত তা অবৈতনিক করার প্রক্রিয়া চলছে।

২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। জাতীয় সংসদে চৌষট্টি জন এবং স্থানীয় সরকার পরিষদের সংরক্ষিত আসনে বার হাজার আট শো আঠাশ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। মন্ত্রীসভায় পাঁচ জন নারী সদস্য রয়েছেন যাঁরা কৃষি, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, শ্রম ও জনশক্তি এবং নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। আমি নিজে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও বিরোধী দলের নেতা, সংসদ উপনেতা এবং জাতীয় সংসদের একজন হুইপ নারী। এই প্রথমবারের মত জাতীয় সংসদের দু'টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারপার্সন হয়েছেন দু'জন নারী। উচ্চ আদালত, সামরিক-বেসামরিক এবং পুলিশ বাহিনীর উচ্চপদে অনেক নারী সদস্যগণ যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমেও আমাদের অনেক নারী সদস্য রয়েছেন। নারী উদ্যোক্তাগণ এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন।

আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য আমরা কাজ করছি। আর এ কাজে আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী ''ডিজিটাল বাংলাদেশ'' গড়ার কাজ শুরু করেছি। এর মাধ্যমে আমরা তথ্যপ্রযুক্তিকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিচ্ছি।

আমরা এ বছরই চার হাজার পাঁচশোটি তথ্য ও সেবাকেন্দ্র উদ্বোধন করেছি। সেই অনুষ্ঠানে ইউএনডিপি'র প্রধান মিস হেলেন ক্লার্ক উপস্থিত ছিলেন। এসব তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামের কোটি কোটি মানুষের কাছে ইন্টারনেট পরিসেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আমরা আট হাজার পাঁচশোটি পোস্ট অফিসকে ই-পোস্ট অফিসে রূপান্তর করেছি। এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা পাচ্ছেন। এছাড়াও একটি 'হাইটেক পার্ক', ই-গভর্ণেন্স এবং বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা একটি জরুরি অনুষঙ্গ। প্রতি ছয় হাজার গ্রামীণ মানুষের জন্য একটি করে কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এগার হাজার কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি শিশুদের অটিজম এবং Development Disorder বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির ব্যাপারে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে গত জুলাই মাসে আমরা ঢাকায় গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ ইনিশিয়েটিভ উদ্বোধন করেছি।

তবে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের এসব উদ্যোগ সফল করতে এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজন। উন্নত বিশ্বের বাজারে আমাদের পণ্যের অবাধ প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি, বাণিজ্য বাধা অপসারণ, বৈদেশিক সাহায্যের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার মোকাবিলায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এসব সহায়তা আসতে পারে।

গত মে মাসে ইস্তাম্বুলে কৃষি, জ্বালানি অবকাঠামো, পানি, অভিবাসন বিষয়ে যেসব অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক হবে। দোহা রাউন্ডের সফল সমাপ্তির জন্য মন্টেরি, প্যারিস এবং ব্রাসেলস-এ উন্নয়ন সহযোগীরা যেসব অঙ্গীকার করেছে, তা বাস্তবায়নের এখনই উপযুক্ত সময়।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের জন্য এই ধরনের সহায়তার নিশ্চয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পেলে আমাদের এক-পঞ্চমাংশ এলাকা

পানিতে তলিয়ে যাবে। এরফলে ত্রিশ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়বে। এমনটি হলে তা হবে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহতম মানবিক বিপর্যয়। এজন্য আমরা ১৩৪-দফা Adaptation and Mitigation কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। এর আওতায় নদীখনন, শতকরা কুড়ি ভাগ ভূমির বনায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম ফসলের জাত উদ্ভাবনের উদ্যোগ নিয়েছি।

আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে তিন শো মিলিয়ন ইউএস ডলারের ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। এছাড়া দাতাদের সহযোগিতায় এক শো মিলিয়ন ইউএস ডলারের ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলেন্স ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেছি।

মাননীয় সভাপতি,

বিশ্বের প্রায় তিনশো মিলিয়ন মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। আমি বাংলাভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দিতে আমাদের আবেদনের প্রতি সকলের সমর্থন কামনা করছি।

২০০০ সালে আমি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলাম তখন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে "A culture of peace" নামে Annual Flagship Resolution উপস্থাপন করেছিলাম। আমি আজকে আবারও সেই প্রস্তাবের পক্ষে আপনাদের সমর্থন কামনা করছি।

সম্মানিত সভাপতি,

গত অর্ধশতাব্দী ধরে আমি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছি। পুরো সময় জুড়ে আমি ছিলাম শান্তির পক্ষে একজন অগ্রণী ও নির্ভিক যোদ্ধা। আমি মনে করি জবরদস্তি এবং আইনের শাসনের অনুপস্থিতির মত অবিচার নিরসনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অসাম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বঞ্চনা, দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িকতা, নারী এবং ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকারহীনতা এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে।

Uppsala Data Programme অনুযায়ী ১৯৬৪ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এসব অন্যায্য কর্মকান্ডের ফলে গোটা বিশ্বে পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাতিসংঘের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা জোরদার করার মাধ্যমে এসব অপমৃত্যু পরিহার করা যেত। শান্তি এবং উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষকে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে এই প্রাণহানি অবশ্যই এড়ানো সম্ভব হত।

আমার সারাজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আপনাদের সামনে একটি শান্তির মডেল উপস্থাপন করতে চাই যার ভিত্তি হচ্ছে **"জনগণের ক্ষমতায়ন"**। এটি একটি বহুমাত্রিক ধারণা যেখানে গণতন্ত্র এবং উন্নয়নকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে, যার কেন্দ্রে আছে জনগণের ক্ষমতায়ন। এতে রয়েছে ছয়টি পরস্পর ক্রিয়াশীল বিষয় যা শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এগুলো হচ্ছে (১) ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, (২) বৈষম্য দূরীকরণ, (৩) বঞ্চনার লাঘব, (৪) ঝড়েপড়া মানুষদের সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি, (৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং (৬) সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন।

আমি এর নাম দিয়েছি **"জনগণের ক্ষমতায়ন মডেল"**। এর মূল বিষয় হচ্ছে সকল মানুষকে সমান চোখে দেখা। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন জনগণের ক্ষমতায়ন এবং মানবিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

সমৃদ্ধি অর্জন তখনই সম্ভব যখন সমাজ থেকে আমরা অবিচার এবং মানুষের ক্ষমতাহীনতা দূর করতে পারবো। এজন্য প্রতিটি রাষ্ট্রকে আন্তরিকভাবে সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানের এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

আসুন, আমরা জনগণের ক্ষমতায়নের এ মডেলটি প্রয়োগ করে দেখি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর মাধ্যমে সাত বিলিয়ন মানুষের এই বিশ্বকে আমরা পাল্টে দিতে পারব। এমন একটি বিশ্ব গড়তে সক্ষম হব যেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

সম্মানিত সভাপতি আপনাকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
জাতিসংঘ দীর্ঘজীবী হোক।